Bangladesh Journal of Political Economy

© 2011 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 27, No. 1 & 2, 2011, pp. 345-362
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দারিদ্র ও বৈষম্য হ্রাস: উক্ত ও অনুক্ত বিষয়াদি

আবুল বারকাত [১]

দারিদ্র ও বৈষম্য পরিমাপ ও মাত্রা: ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যা বলছে

বাংলাদেশের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (অর্থবছর ২০১১-২০১৫) দলিলে বলা হয়েছে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য প্রকৃতিগতভাবে নির্দেশনামূলক (indicative) এবং কৌশলগত (strategic)। আর সে কারণেই তিন খ-ের পরিকল্পনা দলিলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মূল নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে সম্ভাব্য ভবিষ্যত-এর একটি পথরেখা বিনির্মাণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে (তবে, দলিলটি ইংরেজী ভাষায় রচিত!)। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই বলা হয়েছে যে অতীতে বেশ কিছু প্রগতি হলেও বাংলাদেশ সরকার মনে করে যে বাংলাদেশ এখনও একটি স্বল্প-আয়ের দেশ যেখানে দারিদ্র, বৈষম্য ও বঞ্চনা প্রকট। পরিকল্পনা দলিলে দারিদ্র-বৈষম্য-বঞ্চনা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে মূলত: ২টি অধ্যায়ে বলা হয়েছে: প্রথম খ-ের (Part 1) ষষ্ঠ অধ্যায়ে "Poverty, Inclusion and Social Protection" শিরোনামে, এবং দ্বিতীয় খ-ের (Part 2) নবম অধ্যায়ে "Reaching out the Poor and Vulnerable Population" শিরোনামে। সংশ্লিষ্ট বিষয় অন্যান্য অধ্যায়েও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, আর সেই সাথে তৃতীয় খ-ে CGE Model সহ বেশ কিছু পরিসংখ্যানিক বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিলে 'দারিদ্র-বঞ্চনা-বৈষম্য' মাত্রা পরিমাপ করা হয়েছে যথেষ্ট সংকীর্ণ অর্থে (narrow measures) এবং সেই সাথে দারিদ্রের বহুমুখী মাত্রাসমূহ নিয়ে অনেক কিছুই অনুক্ত রয়ে গেছে। দারিদ্র-বৈষম্য পরিমাপে মূলত: যেসব নির্দেশক ব্যবহৃত হয়েছে তা হল: দারিদ্রের মাথা-গণনা পদ্ধতি (head count method), খাদ্য-পরিভোগ সংশ্লিষ্ট দারিদ্র, আয়-বৈষম্য (গিনি সহগ), আঞ্চলিক-ভৌগোলিক বৈষম্য ইত্যাদি। বলা হয়েছে দেশে দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে (মাথাগণনা পদ্ধতিতে ২০০৫ সালের ৪০% থেকে এখন ২০১০ সালে ৩১.৫% এ) তবে আয়-বৈষম্য বেড়েছে এবং আঞ্চলিক-ভৌগোলিক বৈষম্য বিদ্যমান।

১ অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ই-মেইল: hdrc.bd@gmail.com, hdrc@bangla.net)

'দরিদ্র' বলতে পরিকল্পনা দলিলে যাদের বুঝানো হয়েছে তাদের অন্তর্ভুক্ত হলেন সম্পদের মালিকানার নিরিখে দরিদ্র; প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নে যাদের অভিগম্যতা নেই; অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মানুষ (যাদের শ্রমের উৎপাদনশীলতা স্বল্প); মৌলিক সেবাখাত (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাবার পানি, স্যানিটেশন)-এ যাদের অভিগম্যতা অপ্রতুল; প্রাকৃতিক দুর্যোগের অভিঘাত যাদের উপর তুলনামূলক বেশী; নারী প্রধান খানা; সামাজিকভাবে বহিঃস্থ মানুষ; প্রত্যন্ত-দুর্গম এলাকার মানুষ; অন্যান্য ভঙ্গুর জনগোষ্ঠি ইত্যাদি। আর সমাধানের পথ হিসেবে অন্যান্য পথ-পদ্ধতির সাথে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচী (social protection programme)-র উপর জোর দেয়া হয়েছে

পরিকল্পনা দলিলে বলা হয়েছে যে 'অপারেশনাল লেভেল'-এ মৌলিক কর্মকা- হিসেবে এমন কৌশল, নীতি ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে যা ২টি বিষয় ত্বরান্বিত করবে: (১) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (economic growth) এবং (২) দারিদ্র হ্রাস। এবং এ দু'য়ের মধ্যে বেশি জোর দেয়া হয়েছে প্রবৃদ্ধির উপর। যুক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন দ্রুততালে দারিদ্র হ্রাসের পূর্বশর্ত। সেইসাথে বলা হয়েছে যে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান বৃদ্ধি টেকসইভাবে দারিদ্র হ্রাসের পন্থা। এক্ষেত্রে যথার্থই বলা হয়েছে যে মোট শ্রমশক্তির ৭৮% অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত, যাদের আনুষ্ঠানিক খাতে নিতে হবে। আর এসব নিশ্চিতকরণে উল্লেখ করা হয়েছে যে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে: এখনকার ২৪.৪% (জিডিপি-র) থেকে ২০১৫ সাল নাগাদ ৩২.৫% (জিডিপি-র) এ। হিসেব দেয়া হয়েছে যে পরিকল্পনার পাঁচ বছরে (২০১১-২০১৫) সর্বমোট বিনিয়োগ করতে হবে ১৩.৫ ট্রিলিয়ন (১৩,৪৬,৯৪০ কোটি) টাকা (২০১১ অর্থবছরের স্থায়ী মূল্যমানে): যার মধ্যে ২২.৮% সরকারী বিনিয়োগ আর বাদবাকী ৭৭.২% বেসরকারী; ৯০.৭% অভ্যন্তরীণ উৎস আর বাদবাকী ৯.৩% বৈদেশিক উৎস (যেখানে ০.৪ ট্রিলিয়ন টাকা বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ)। উল্লেখ করা হয়েছে যে, উচ্চতর প্রবৃদ্ধির উৎস হবে "ফ্যাক্টর পুঞ্জিভবন" (factor accumulation অর্থাৎ শ্রম ও পুঁজি); জোর দেয়া হয়েছে মোট ফ্যাক্টর উৎপাদনশীলতার (total factor productivity) উপর; বলা হয়েছে বর্ধিত বিনিয়োগের বড় অংশ ব্যয় হবে অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে (প্রধানত বিদ্যুৎ, জ্বালানি, যোগাযোগ) এবং মানব উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট অর্থায়নে।

পরিকল্পনা দলিলে গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দারিদ্র হ্রাস করেছে তবে আয় বৈষম্য বাড়িয়েছে। এখন আয়-বণ্টনজনিত বৈষম্য খাদ্য-পরিভোগজনিত বৈষম্যের চেয়ে বেশী; আয়-বৈষম্যের গিনি সহগ ২০০০ সালে ছিল ০.৪৫১ আর তা ২০০৫-এ দাঁড়িয়েছে ০.৪৬৭-এ। বলা হয়েছে পরিকল্পনাধীন সময়কালে এ বৈষম্য হ্রাস হবে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। তবে আমার জানা মতে আর বৈষম্য নিরূপণের এসব হিসেবে কালোটাকা অথবা অপ্রদর্শিত আয় অনমশর্ভুক্ত নয়; আর সেইসাথে আয়-বৈষম্য হিসেবের সংখ্যাতাত্বিক ভিত্তি নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

পরিকল্পনা দলিল বলছে যে বৈষম্য (inequality) সৃষ্টি হয় ভৌত সম্পদ (physical asset) ও মানব পুঁজির (human capital) অসম বণ্টনের কারণে। বৈষম্য এ দু'য়ের সমাহার। বলা হয়েছে যে দরিদ্র মানুষের যা অপ্রতুল অথবা খুবই কম আছে তা হল **ভূমি**, পুঁজি, ক্রেডিট, দক্ষতা (অর্থাৎ factor endowment)। নারীদের ক্ষেত্রে আছে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা। এসব 'factor endowment'-এ দরিদ্র মানুষের অভিগম্যতার (access) সীমাবদ্ধতা এক ধরণের ফাঁদ সৃষ্টি করেছে, যা না ভাঙ্গলে দারিদ্র কমবে না। এক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে দারিদ্র হ্রাস করতে হলে সেচের পানি, সার, বিদ্যুৎ, গ্রামীণ রাস্তা এবং প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নে দরিদ্র মানুষের অভিগম্যতা বাড়াতে হবে। তবে সমাধান হিসেবে কৃষি-

ভূমি-জলা সংস্কারের প্রসঙ্গ উত্থাপনই করা হয়নি। যদিও ভূমিহীন দরিদ্র কৃষককে খাস জমি দেয়া, আর দরিদ্র মৎস্যজীবীকে খাস জলা দেয়াসহ ভূমি সংস্কারের স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ছিলো ২০০৮-এর নির্বাচনী ইশতেহারে। সমাধান কৌশল হিসেবে বলা হয়েছে যে সরকারি মৌল সেবাখাতসমূহে দরিদ্র মানুষের অভিগম্যতা বাড়াতে হবে; সেবা সরবরাহ কর্মপদ্ধতি হতে হবে স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিতামূলক; এসবে দরিদ্র মানুষের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। এর পরপরই বলা হয়েছে যে এতকিছুর পরেও বাদ পড়তে পারেন অনেকেই যেমন ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠি, অবহেলিত এবং সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন-বহিঃস্থ মানুষ, প্রতিবন্ধী, প্রবীণ, শিশু, নারী ইত্যাদি। আর বাদ-পড়া এসব মানুষের ক্ষেত্রে জোর দেয়া হয়েছে সামাজিক সুরক্ষা (নিরাপত্তা) কর্মসূচী (social protection programme) জোরদার করণে। নারীর জন্য প্রেসক্রিপশন হলো নারীকে আর্থ-সামাজিক জীবনে একীভূতকরণ এবং রাজনীতি-অর্থনীতিসহ সমাজের সর্বস্তরে নারীদের জন্য সমসুযোগ নিশ্চিত করা। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টিকে এনে বলা হয়েছে ঋণাত্মক অভিঘাত বেশি পড়বে দরিদ্র মানুষ এবং নারী-শিশুর উপর।

দারিদ্র-বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির উপর জোর দিয়ে বলা হয়েছে এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে মানুষের আয় ও কর্মসংস্থান বাড়বে। বলা হচ্ছে কৃষিতে ভূমির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে; কৃষি বহুমুখীকরণ করতে হবে; এবং শক্তিশালী কৃষি হবে দারিদ্র হ্রাস ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের প্রধান মাধ্যম। বলা হয়েছে ভূমিহীন কৃষক সবচে বেশি দরিদ্র; আর সমস্যা সমাধানে বলা হয়েছে যে ভূমি প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা ঠিক-ঠাক করলে গ্রামাঞ্চলে জন-সমৃদ্ধি বাড়বে এবং দারিদ্র হ্রাস হবে– বলা হয়নি কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের কথা।

গ্রামে ভূমিহীনতার সাথে সাথে শহরে বস্তিবাসীর সংখ্যা বাড়ছে এবং সেই সাথে আবাসন সমস্যা প্রকটতর হচ্ছে– এ কথা পরিকল্পনা দলিলে বলা হয়েছে। কিন্তু গ্রামে ভূমিহীনতার প্রক্রিয়া রোধের পথ-পদ্ধতি বলা হয়নি; সেই সাথে নগর-দরিদ্রদের আবাসন সমস্যার প্রকৃত সমাধান নিয়ে তেমন কথা নেই।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র হ্রাসের অঞ্চলগত-ভৌগোলিক দিক সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা হলো প্রথমত: নগরায়ন এক-শহর কেন্দ্রিক (ঢাকা); আর আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসে ভাল করেছে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট– খারাপ করেছে রংপুর, বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী। পিছিয়ে পড়া অঞ্চল নিয়ে ভাবতে হবে– বলা হয়েছে।

প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে তৈরি পোশাক শিল্প এবং প্রবাসে কর্মরত শ্রমশক্তি। বলা হয়েছে তৈরি পোশাক শিল্পের কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে; অদক্ষ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত (দক্ষ) শ্রমশক্তি রপ্তানীতে জোর দিতে হবে। সেই সাথে তথ্য-প্রযুক্তির বিকাশ ও এক্ষেত্রে মানুষের অভিগম্যতা বাড়াতে হবে– দলিলে বলা হয়েছে।

দারিদ্র ও বৈষম্য হ্রাসের কৌশল: পরিকল্পনা দলিল যা বলছে

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিলের প্রথম খ-ের ষষ্ঠ অধ্যায়ে দারিদ্র হ্রাস কৌশল সংশ্লিষ্ট নীতি ও কর্মসূচীসমূহ বিবৃত হয়েছে (পৃ: ১৪৬-১৪৮)। অতীতের নীতি-কৌশল বিশ্লেষণ করে ৪টি প্রণিধানযোগ্য বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে:

১. দারিদ্র মাত্রা এখনও অত্যুচ্চ এবং দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের মোট সংখ্যা

কমেনি, ১৯৯১-৯২ সালের মতোই আছে (প্রায় ৫ কোটি ৬০ লাখ)। দেশের এক-চতুর্থাংশ মানুষ (৩ কোটি ৬০ লাখ) খাদ্য-দারিদ্রের পরিমাপে চরম দরিদ্র। এসব মানুষ অর্দ্ধভুক্ত এবং চরমভাবে ভঙ্গুর; এদের এমন কোনো সম্পদ নেই (নিজের শ্রমশক্তি ছাড়া) যে তারা ক্ষুধা প্রতিরোধ করবে অথবা অসুস্থতা, বন্যাসহ অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবেলা করবে।

২. ১৯৯০-এর দশকে দ্রুততালে দারিদ্র হ্রাসের সাথে সাথে বেড়েছে আয় ও ব্যয় বণ্টনজনিত বৈষম্য– যা নীতি-নির্ধারকের জন্য চিন্তার (দুশ্চিন্তার) বিষয়। যেহেতু ক্রমবর্ধমান বৈষম্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র হ্রাসের গতি হ্রাস করে এবং সামাজিক অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়ায় সেহেতু বিষয়টি গভীর মনোযোগের দাবি রাখে।

৩. দারিদ্রের আঞ্চলিক (regional) ভেদ আছে। দারিদ্র সেসব এলাকায় বেশি যেসব অঞ্চল বন্যাপ্রবণ, নদী ভাঙ্গনপ্রবণ, এক ফসলী ইত্যাদি। দেশের পশ্চিমাঞ্চলে (রাজশাহী বিভাগ, তারপরে খুলনা ও চট্টগ্রাম) দারিদ্র সবচে' বেশি। পিছিয়ে পড়া অঞ্চল বিষয়টি গুরুতর সামাজিক চ্যালেঞ্জ।

৪. সময়ের নিরিখে দারিদ্র পরিমাপের এসব স্থির (static point-in-time) পরিমাপ পদ্ধতি ব্যবহার করে খানাভিত্তিক দারিদ্রের ওঠা-নামা ('দরিদ্র পাইপে' ঢুকা-বেরুনো) বোঝা সম্ভব নয়। গবেষণায় প্রমাণিত (empirical evidence) যে স্থির (static) পরিমাপনে দারিদ্রের তুলনায় গতিশীল (dynamic) পরিমাপন পদ্ধতিতে দারিদ্র বেশি।

অর্থাৎ সংকীর্ণ পরিমাপন পদ্ধতি ব্যবহার করেই পরিকল্পনা দলিল স্পষ্ট বলছে যে দেশে দরিদ্র মানুষের মোট সংখ্যা কমেনি; দারিদ্র কমার সাথে সাথে আয় ও ব্যয় বণ্টনজনিত অসমতা-বৈষম্য বেড়েছে; দারিদ্রের ভৌগোলিক ভেদ আছে; দারিদ্র-বৈষম্য সামাজিক অস্থিরতার কারণ হতে পারে; এবং সবশেষে স্বীকার করছে যে দারিদ্র পরিমাপের স্থির পদ্ধতি দেশে দারিদ্রের প্রকৃত সত্য চিত্রিত করে না।

এসব কথা বলেই ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকীর পরিকল্পনা দলিলে দারিদ্র হ্রাস কৌশলের আওতায় সংশ্লিষ্ট নীতি (policies) ও কর্মসূচীর (programmes) একটি তালিকা সন্নিবেশিত হয়েছে (প্রথম খ-ের ষষ্ঠ অধ্যায়ে)। যেখানে দারিদ্র হ্রাসের লক্ষ্যে করণীয় হিসেবে বলা হচ্ছে নিম্নরূপ (পৃ: ১৪৭-১৪৮):

১. প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প খাত ও সেবা খাতে উচ্চতর শ্রম-উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ উচ্চতর প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা;

২. উচ্চতর উৎপাদনশীলতাসহ ফার্ম-এর আয় বৃদ্ধি;

৩. উৎপাদনী উপকরণ (সার, বীজ, সেচ, বিদ্যুৎ, গ্রামীণ রাস্তা) সমূহ এবং প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নে দরিদ্র মানুষের অভিগম্যতা বৃদ্ধি;

৪. উন্নত অবকাঠামো ও মানব পুঁজিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে পশ্চাৎপদ অঞ্চলের সাথে প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রসমূহের যোগাযোগ সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি;

৫. দরিদ্র অঞ্চল থেকে অভিবাসন বাড়ানো (যেহেতু প্রবাসে কর্মরতদের অর্থের সাথে দারিদ্র হ্রাসের সম্পর্ক আছে);

৬. প্রবাস থেকে ফেরত আসা অভিবাসীদের জন্য উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ;

৭. শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ সক্রিয়তর করা;

৮. নতুন নতুন দেশে শ্রমশক্তি রপ্তানী উৎসাহিত করা এবং বর্তমান প্রবাসী শ্রমবাজার সম্প্রসারিত করা;

৯. প্রজনন হার জনউর্বরতা (fertility) হ্রাসের অতীত সাফল্য ধরে রাখা;

১০. মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবায় দরিদ্র খানার অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা;

১১. সামাজিক সুরক্ষা (নিরাপত্তা) কর্মসূচীসমূহের সমন্বয় শক্তিশালী করা এবং টার্গেটিং ও আওতা বৃদ্ধি করা;

১২. ক্ষুদ্র ঋণের প্রতি অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা;

১৩. খাদ্য পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখা; এবং

১৪. জলবায়ু পরিবর্তনের ঋণাত্মক অভিঘাত মোকাবেলায় মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

সেইসাথে দারিদ্র হ্রাস কৌশল নিয়ে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিলের দ্বিতীয় খ-ের নবম অধ্যায়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে দারিদ্র হ্রাসের সবচে কার্যকর পন্থা হলো উৎপাদনী-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, যা সহজে অর্জন যোগ্য নয় (পৃ: ৩৮৪)। এক্ষেত্রে শ্রমবাজারের চাহিদার দিক (যা মুলত: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি চালিত) এবং সরবরাহের দিক (অর্থাৎ শ্রম চাহিদার প্রবৃদ্ধি এবং গুণগত মান) সংশ্লিষ্ট কৌশল ও কর্মকা-যুতসই করা জরুরি। এ লক্ষ্যে পরিকল্পনা দলিলে কিছু কৌশলগত সুপারিশ করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ (পৃ: ৩৮৪-৩৮৮):

১. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা।

২. শ্রমশক্তি বৃদ্ধির সুফল কাজে লাগানো (demographic dividend) এবং শ্রমশক্তির গুণগত মান বৃদ্ধি করা।

৩. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৪. প্রবৃদ্ধির আঞ্চলিক-ভৌগোলিক দিকসমূহের ভারসাম্যতা নিশ্চিত করা।

৫. আয় বৈষম্য হ্রাস করা।

৬. অনগ্রসর-পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির সামাজিক সুরক্ষা (নিরাপত্তা) নিশ্চিত করা।

৭. জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা।

৮. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত ঋণাত্মক প্রভাব থেকে দরিদ্র মানুষকে রক্ষা করা এবং টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

দারিদ্র -বৈষম্য নিয়ে পরিকল্পনা দলিল ও "ভাবনার দারিদ্র"

আমার মনে হয় ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিলের প্রণেতারা দারিদ্রের সংজ্ঞায়নে ব্যর্থ হয়েছেন। তারা দরিদ্র মানুষের দৃষ্টিতে দারিদ্র দেখেননি। এ প্রয়াসও নেননি; সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন। চিরাচরিত গতানুগতিকতার উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। দারিদ্র পরিমাপের প্রয়াসও দরিদ্র মানুষের দৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে হয়। কারণ, মাথাপিছু নির্দিষ্ট পরিমাণের আয়, মাথাপিছু ২,১২২ কিলোক্যালরির নীচে খাদ্য

ভোগ, সাক্ষরতা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রকৃত নিরক্ষরতা হ্রাস না পাওয়া, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ সৃষ্টি করা (দরিদ্ররা সে সুযোগ গ্রহণ করুক বা না করুক) – দারিদ্র সংজ্ঞায়ন ও পরিমাপণে এসব স্থূলতা অতিক্রম করা যায়নি ।

"দারিদ্র" আমার মতে নেহায়েত এক অর্থনৈতিক প্রপঞ্চ নয় যা 'আয়' এবং/অথবা 'খাদ্য পরিভোগ' দিয়ে মাপা হয় । যেমন বলা হয় – যদি কেউ দৈনিক ৬৭ টাকার কম আয় অথবা ২,১২২ কিলো ক্যালরির কম খাদ্য ভোগ করেন তিনিই দরিদ্র, আর তার অবস্থাটা "দারিদ্র" । দারিদ্র পরিমাপের এ স্থূলতার বিপরীতে আমি মনে করি যা কিছু মানুষের পরিপূর্ণ জীবন প্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করে সে সবই দারিদ্রের মানদ- । দারিদ্র হলো সুযোগের অভাব বা সমসুযোগের অভাব । আর বৈষম্য-বঞ্চনা থেকেই এর উৎপত্তি । এ বৈষম্য-বঞ্চনা প্রধানতঃ অর্থনৈতিক হলেও শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয় ।

দারিদ্র বহুমুখী । দারিদ্র হতে পারে আয়ের দারিদ্র, কর্মহীনতার দারিদ্র, স্বল্প-মজুরীর দারিদ্র, ক্ষুধার দারিদ্র, আবাসনের দারিদ্র, শিক্ষার দারিদ্র, স্বাস্থ্যের দারিদ্র, অস্বচ্ছতা-উদ্ভূত দারিদ্র, শিশু দারিদ্র, প্রবীণ মানুষের দারিদ্র, নারী-প্রধান খানার দারিদ্র, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকের দারিদ্র, ভাসমান মানুষের দারিদ্র, প্রতিবন্ধী মানুষের দারিদ্র, 'মঙ্গা' এলাকার মানুষের দারিদ্র, বহিঃস্থ জনগোষ্ঠির দারিদ্র, বস্তিবাসী ও স্বল্প-আয়ি মানুষের দারিদ্র, পরিবেশ-প্রতিবেশ বিপর্যয়ের দারিদ্র, নিরাপত্তাহীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র, প্রান্তিকতা উদ্ভূত দারিদ্র (অনানুষ্ঠানিক সেক্টর, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু, নিম্নবর্ণ-দলিত, পশ্চাৎপদ-পেশা, চর-হাওর-বাওর-এর মানুষ), রাজনৈতিক দারিদ্র (রাষ্ট্রিয় নীতি-নির্দ্ধারণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ না করতে পারার কারণে দারিদ্র), রাষ্ট্র-সরকার পরিচালনাকারীদের প্রতি আস্থাহীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র, মানস-কাঠামোর (mind set) দারিদ্র ইত্যাদি । আমি মনে করি দারিদ্রকে দেখতে হবে সব ধরনের দারিদ্রের পরস্পর সম্পর্কিত যৌথ রূপ হিসেবে যেখানে প্রতিটি রূপ ভিন্ন ভিন্নভাবে দারিদ্রের নির্দিষ্ট অংশকে প্রতিফলিত করে মাত্র । তবে এমনও হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক মুহূর্তে দারিদ্রের কোনো এক বা একাধিক রূপ অন্যসব রূপের তুলনায় অধিক গুরুত্ব বহন করে । সেই সাথে এ কথাটি স্পষ্ট হতে হবে যে দারিদ্র হ'তে পারে তুলনামূলক অথবা নিরঙ্কুশ । সুতরাং আমার বিশ্বাস 'দারিদ্র বিমোচন' বললে আমরা বুঝবো দারিদ্রের কোনো কোনো রূপের তুলনামূলক হ্রাস আবার কোন কোনটির নির্মূল বা উচ্ছেদ ।

আমার সার বক্তব্য এক বাক্যেও শেষ করা যেতে পারে । আর তা হলো: যেহেতু দারিদ্র বিষয়টি শেষ পর্যন্ত শোষণ সৃষ্টিকারী কাঠামো উদ্ভূত (structural) সেহেতু স্থায়ীভাবে দারিদ্র বিমোচন করতে হলে বর্তমান কাঠামোটি ভেঙ্গে তার জায়গায় নূতন কাঠামো বসাতে হবে; আর যুক্তিগতভাবেই এ কাজটি পারে দরিদ্র শোষিত মানুষের স্বার্থরক্ষাকারী রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞ । এ বক্তব্যে সাম্যবাদী মতাদর্শের গন্ধ আছে বিধায় অনেকেই বাতিলযোগ্য বিবেচনা করলেও যুক্তি হিসেবে বক্তব্যে ভুল নেই । ভুল-ভ্রান্তি থাকলে তা আছে সময়ের নিরিখে সম্ভাব্যতা বিচারে । সে কারণেই বক্তব্য এক কথায় শেষ করা যাচ্ছে না । বক্তব্য এক কথায় শেষ করা যাবে না এ জন্যেও যে আমরা সবাই মিলে আপাতত ধরেই নিয়েছি যে সম্ভবত: "মুক্ত বাজার" পুঁজিবাদী কাঠামোতেই আমাদের চলতে হবে; ধরেই নিয়েছি যে মাত্রা যাই হোক না কেন বাজার অর্থনীতির আবরণের মধ্যেই দারিদ্র হ্রাস/উচ্ছেদ(?)/বিমোচন হতে পারে; ধরেই নিয়েছি যে আমাদের দেশে বাণিজ্যপুঁজি ও ব্যাপক-বিস্তৃত (বিকাশমান) কালো টাকার পুঁজিকে (যা নিকৃষ্ট পুঁজি; গত ৩৫ বছরে যার পুঞ্জীভূত পরিমাণ হবে আনুমানিক ৭ লাখ কোটি টাকা) যে কোন ভাবে শিল্প পুঁজিতে রূপান্তর করলেই দারিদ্র দূরীভূত হবে; ধরেই নিয়েছি যে জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বিশ্বায়ন-এর

সুযোগ(!) গ্রহণ করতে পারলেও দারিদ্রাবস্থা যথেষ্ট উপশম হবে ইত্যাদি। এসব ধরে নেয়ার পিছনের যুক্তি কতটা যুক্তিসিদ্ধ ও বাস্তবসম্মত এ বিচারে না যেয়ে 'ধরে নেয়া' অনুসিদ্ধান্ত মেনেই আজকের আলোচনা।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও দাতাগোষ্ঠির দারিদ্র সংক্রান্ত দলিলপত্র প্রায়ই সরলীকৃত দারিদ্রের আপাতন (incidence of poverty)-কে সবচে' বেশি গুরুত্ব দেয়। এই ভিত্তিতেই বলা হচ্ছে, বাংলাদেশে দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে ১৯৮৫/৮৬ সালের ৫৫.৭ শতাংশ থেকে ২০০৪ সালে ৪০.৪ শতাংশে আর এখন ২০১০ সালে ৩১.৫ শতাংশ [head count ratio based on DCI method অর্থাৎ খাদ্য ভোগ (প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ) এর হিসেবে মাথা-গণনা পদ্ধতিতে]। অর্থাৎ সরকারী হিসেবে গত ২৫ বছরে দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে প্রায় ৪৫ শতাংশ। অথচ একই সরকারী দলিল বলছে দরিদ্র মানুষের নিরংকুশ সংখ্যা বেড়েছে। অর্থাৎ এমনকি সরকারী স্থূল হিসেবকে আমলে নিয়েও স্পষ্ট বলা যায় যে, তুলনামূলক দারিদ্র (শতাংশ হিসেবে) হ্রাস পেলেও মোট দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পেতে থাকবে। তিরিশ বছর আগে ৭০ ভাগ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করতো। তখন মোট দরিদ্রের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি। এখন সরকারী হিসেবে প্রায় ৩২ ভাগ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করলেও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি। এ দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় বেশী। সুতরাং দারিদ্রের আপতন-ভিত্তিক স্থূল হিসেবপত্তরও নির্দেশ করে যে, দেশে দারিদ্র হ্রাস পায় নি।

আসলে 'দরিদ্র' কে? পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিলে 'দরিদ্র' মানুষের এক ধরণের চিত্র আছে; আছে সংবিধানসহ 'রূপকল্প ২০২১' এর কথা। কিন্তু, নেই দরিদ্র মানুষের সাথে সাংবিধানিক বিধানের সম্পর্কের কথা। আমার ধারণা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন **সংবিধানের** "রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি" ও "মৌলিক অধিকার" সংক্রান্ত ৮ থেকে ৪৩ পর্যন্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত জনগণের মৌলিক চাহিদা থেকে **বঞ্চিতরাই** দরিদ্র। এ হিসেবে বাংলাদেশের শতকরা ৮৩ ভাগ মানুষই দরিদ্র। সাংবিধানিক অধিকার (১৯৭২) থেকে বঞ্চিতরাই দরিদ্র। বহুমাত্রিক মানব বঞ্চনা দূরীকরণে আমাদের সংবিধান অনেকগুলি অধিকার নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেয়।[১]

আমি মনে করি দরিদ্র মানুষেরা বঞ্চিত অথবা বঞ্চিতরাই দরিদ্র – এ বঞ্চনা হতে পারে সাংবিধানিক এবং ন্যায়-অধিকার কেন্দ্রিক। আগেই বলেছি খাদ্য-পরিভোগ কেন্দ্রিক দারিদ্র পরিমাপ খুবই স্থূল। বিপরীতে আমি মনে করি দরিদ্র মানুষ বঞ্চিত; বস্তুগত– আত্মিক– আবেগী সম্পদ থেকে বঞ্চিত; যে বঞ্চনা তাদের বেঁচে থাকা–বিকাশ-সমৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত করে; যে বঞ্চনা তাদেরকে করে অধিকারহীন; যা তাদের অন্তর্নিহিত শক্তি/ক্ষমতাকে বিকশিত হতে দেয় না– ফলে তারা সমাজের "সম-সদস্য" হতে পারেন না এবং তারা পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হন না। আর বস্তুগত, আত্মিক ও আবেগী সম্পদ বলতে আমি যা বুঝি তার নির্দেশকসমূহ হলো নিম্নরূপ (এ সবের পরিমাপ যতই জটিল অথবা দুরুহ হোক না কেনো): বস্তুগত সম্পদ = আয়, খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায় অভিগম্যতা, খাস জমি-জলা-বনভূমিতে অধিকার; আত্মিক সম্পদ= উদ্যোগ, জীবনবোধের

১ বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত (২০১১), বাংলাদেশে "দারিদ্র চিন্তা": "ভাবনার দারিদ্র" যেখানে প্রকট, এশিয়াটিক সোসাইটি বক্তৃতামালা, ঢাকা: ০৮ অক্টোবর ২০১১।

পরিপূর্ণতা, আকাঙ্খা, পারস্পরিক সম্পর্ক, আদর্শ মানুষের মডেল; এবং আবেগী সম্পদ= ভালোবাসা-সহমর্মিতা, আস্থা-বিশ্বাস, মর্যাদা, গ্রহণযোগ্যতাবোধ, অন্তর্ভুক্তি, ছিটকে না পড়ার বোধ।

উল্লেখ করা জরুরি যে বাংলাদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস সংক্রান্ত সংখ্যাতাত্ত্বিক তেমন কোনো গবেষণা নেই। এ বিবেচনা থেকে মানুষের প্রকৃত আয়, ভূমি মালিকানা এবং কালো-টাকার মালিকানা একীভূত করে জনসংখ্যার শ্রেণী বিভাজনের চেষ্টা করেছি (দেখুন, বারকাত ২০১১)। আমার হিসেবে ১৫ কোটি মানুষের এ দেশে ৯ কোটি ৮৯ লাখ মানুষই (অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৬৬ শতাংশ) দরিদ্র মানুষ (ছক ১)। প্রকৃত অর্থে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা হবে আরো বেশী। কারণ বাজার অর্থনীতিতে যখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং সেই সাথে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় না এবং প্রকৃত আয় হ্রাস পায় তখন নিম্ন-মধ্যবিত্তরাও আসলে দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত। এ বিবেচনায় আমার হিসেবে বাংলাদেশের ১৫ কোটি মানুষের মধ্যে ১২ কোটি ৪৩ লাখ মানুষ (অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৮৩ শতাংশ)-ই দরিদ্র। অর্থাৎ দরিদ্র মানুষের প্রকৃত সংখ্যাটি সরকারী হিসেবের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩২ শতাংশ নয়– হবে ৮৩ শতাংশ। এই ৮৩ শতাংশ মানুষই নিরন্তর বঞ্চিত। বঞ্চনা হিসেবে দারিদ্র

ছক ১: বাংলাদেশে 'ধনী-দরিদ্র' শ্রেণী পিরামিড
(২০১০-এ মোট জনসংখ্যা = ১৫ কোটি)

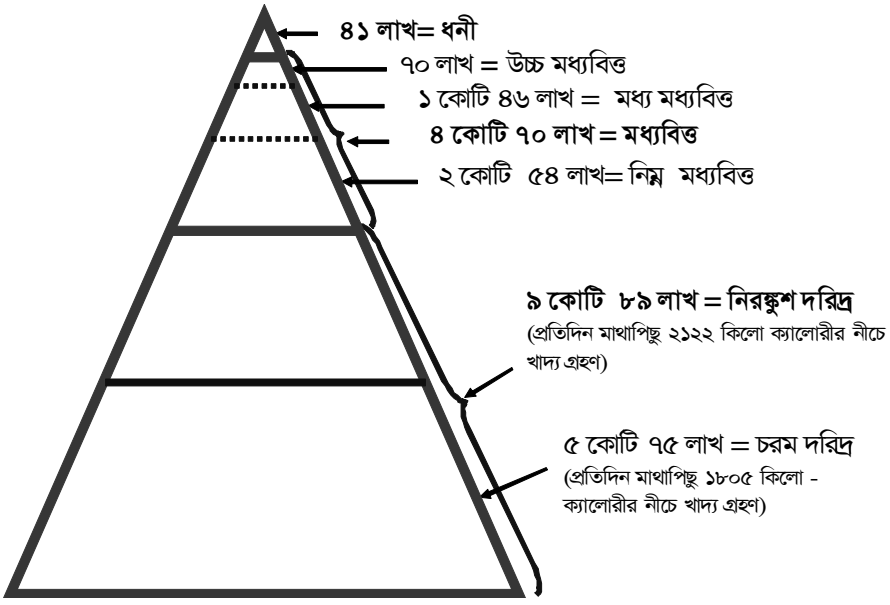

উৎস: আবুল বারকাত (২০১১), প্রাগুক্ত, পৃ: ৪।

এক চক্রাকারে বিবর্তিত হচ্ছে– যে চক্র চূর্ণ করা কঠিন, যে চক্র কাঠামোগত। আর সেই সাথে সময়ের নিরিখে আমাদের দেশে দারিদ্র-বঞ্চনা এক ধরনের পাইপ যে পাইপে দরিদ্র হিসেবে ঢুকবার পথ বেশী আর বেরুনোর পথ কম (দেখুন, বারকাত ২০১১)।

সংবিধানকে দরিদ্র পরিমাপনের ভিত্তি হিসেবে ধরলে আমাদের "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক যে

জনগণ" (অনুচ্ছেদ ৭.১), তাদের ৮৩ ভাগ দরিদ্র। কারণ ১৫ কোটি মানুষের এ দেশে:

- আয়ের অথবা খাদ্য গ্রহণের নিরিখে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ১০ কোটি (যা সংবিধানের ১৪ ও ১৫ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী)।
- প্রায় ৯ কোটি মানুষ এখনও কার্যত নিরক্ষর এবং প্রকৃত শিক্ষা-সুযোগ বঞ্চিত (যা সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদ, বিশেষত ১৭গ অনুচ্ছেদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী)।
- প্রায় ১০ কোটি মানুষ প্রাথমিক স্বাস্থ্য-সেবার সুযোগ বঞ্চিত। আর ৭.৫ কোটি মানুষ সুপেয় পানির অভাবে মরণব্যাধি আর্সেনিক রোগে আক্রান্ত-ঝুঁকির মধ্যে আছেন (যা সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী)।
- প্রতিবছর যে ৬ লাখ মানুষ এদেশে মৃত্যুবরণ করেন তার অর্ধেকই পাঁচ বা আরও কম বয়সের শিশু। আরও লজ্জাজনক কথা, ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ দারিদ্র-উদ্ভূত। নিউমোনিয়ার চিকিৎসায় মাথাপিছু ব্যয় মাত্র ১৩ টাকা, ডায়ারিয়ার ১৭ টাকা, হামের ১২ টাকা এবং যক্ষ্মার ৯০০ টাকা। উল্লেখ্য, যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে আমাদের অবস্থান চতুর্থ শীর্ষে (সংবিধানের ১৫ ও ১৮.১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অবস্থা এমন হবার কথা নয়)।
- সাক্ষর-নিরক্ষর মিলে প্রায় ৩ কোটি মানুষ (যাদের অধিকাংশই যুবক) এখনও বেকার (সংবিধানের ১৫খ ও ২০ অনুচ্ছেদ কর্মের অধিকার নিশ্চিত করে)।
- প্রায় ১০ কোটি মানুষ এখনও বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত (অথচ সংবিধানের ১৬ ধারা এ সুবিধা নিশ্চিত করে)।
- সীমিত আয়ের ব্যাপক সংখ্যক মানুষ প্রকৃত অর্থেই দুর্দশাগ্রস্ত এবং দুর্দশা ক্রমবর্দ্ধমান। এর অন্যতম কারণ দ্রব্যমূল্যের (খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত) উর্দ্ধগতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার ব্যয় এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি। খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জিত হয়েছে কিন্তু দরিদ্র মানুষের খাদ্য-পরিভোগ বৃদ্ধি পায়নি। অন্যদিকে বণ্টন-অসমতা বৃদ্ধি পেয়েছে (এসবই সংবিধানের ১৩, ১৫ ও ১৯ অনুচ্ছেদ-এর সঙ্গে সাযুজ্যহীন)।
- দেশের অধিকাংশ নারী, শিশু ও প্রবীণ নিশ্চিতভাবেই বঞ্চিত (যা সংবিধানের ১০, ১১, ১৫, ১৭, ১৮ ও ২৮ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী)।
- বিরাট এক জনগোষ্ঠি নিশ্চিতভাবেই উত্তরোত্তর অধিক হারে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ছেন। (এসবই সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সকল ধারার পরিপন্থী)।
- ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও আদিবাসী মানুষের বঞ্চনা চিরস্থায়ী রূপ ধারণ করেছে। শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনের মারপ্যাচে ইতোমধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের ৫০ লাখ মানুষের ২০ লাখ একর ভূ-সম্পত্তি জবরদখল করা হয়েছে। এই জবরদখলকারীরা আমাদের জনসংখ্যার মাত্র ০.৪ শতাংশ (ক্ষমতাবান/ক্ষমতাধর গোষ্ঠিভুক্ত)। আর ক্ষুদ্র জাতিসত্তার আদিবাসীরা কি অর্থনীতি, কি শিক্ষা, কি স্বাস্থ্য – সব দিক থেকেই প্রান্তস্থ (এসব কিছুই সংবিধানের ২৭,

২৮, ও ৪১ অনুচ্ছেদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী)।

সংবিধান দারিদ্রদূরীকরণে যা নিশ্চিত করার কথা বলছে আর বাস্তব-প্রবণতা যা দেখছি, তা থেকে আমার হিসেব মতে জাতীয় ক্ষেত্রে দারিদ্র-বৈষম্য বিমোচনে সময় লাগবে ২০০-৩০০ বছর। বিষয়টি নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। দারিদ্র নিরসন কর্মকা- হয় মৌলিক পরিবর্তন নয়তো সংবিধানের ৮ থেকে ৪৩ পর্যন্ত অনুচ্ছেদের আমূল সংশোধন জরুরী (সে ক্ষেত্রে সংবিধানের অন্যান্য ১০৬-টি অনুচ্ছেদেও বিভিন্ন মাত্রায় সংশোধন করতে হবে)। আমার মতে এক্ষেত্রে মধ্যপথের অবকাশ নেই (যদিও আমরা অনেকেই মধ্যপথকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করি)। তাহলে দারিদ্র ও বৈষম্য দূরীকরণে যে অবস্থায় আমরা উপনীত হয়েছি, তা বিশ্লেষণ করে এ কথা বলবো কি'না যে, এ বিষয়ে সংবিধান কার্যকরী নয়?

বিশ্বব্যাংকের প্রাক্তন প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. নিকোলাস স্টার্ন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির লোকবক্তৃতায় বলেছিলেন, "আমার টেবিলে দারিদ্র উচ্ছেদ বা বিমোচন (alleviation অর্থে) শিরোনামে কোনও কিছু এলে আমি সেটা waste paper basket -এ ছুড়ে ফেলে দিই"। অর্থাৎ তার মতে দারিদ্র উচ্ছেদ সম্ভব নয়। বক্তব্যটি আমার কাছে অর্থনীতিবিদদের দারিদ্র বিষয়ক দর্শন-চিন্তারই দারিদ্র বলে মনে হয়। দারিদ্র উচ্ছেদ ও দারিদ্র হ্রাস – ধারণাগত দিক থেকে উভয়ই সঠিক। আসলে দারিদ্রের মাত্রা দুটো – নিরঙ্কুশ দারিদ্র (absolute poverty) আর আপেক্ষিক বা তুলনামূলক দারিদ্র (relative poverty)। আমি মনে করি, মাথাপিছু ২,১২২ কিলোক্যালরির নীচে ভোগ যদি নিরঙ্কুশ দারিদ্রের একটা মাপকাঠি হয়, সেক্ষেত্রে এ মুহূর্তেই বাংলাদেশ থেকে নিরঙ্কুশ দারিদ্র উচ্ছেদ (হ্রাস নয়) সম্ভব। কারণ আমরা এখন যে পরিমাণ খাদ্য শস্য (ধান, গম, ডাল, শাক-সবজি, ফলমূল, মাছ-মাংস ইত্যাদি) উৎপাদন করি সেটাকে মোট কিলোক্যালরিতে রূপান্তর করে মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হবে মাথাপিছু প্রায় তিন হাজার কিলোক্যালরি। সহজ এই পাটিগণিত বাস্তবে কাজ না করার প্রধান কারণ হল বণ্টন-বৈষম্য। আর সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এ বৈষম্য রাষ্ট্রের মূলনীতির পরিপন্থী। কারণ, বলা হচ্ছে "বণ্টন প্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ"। আসলে মূলনীতি শীর্ষক সংবিধানের ৮ অনুচ্ছেদে বর্ণিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা, ১৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত মানুষে-মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপের মাধ্যমে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিতকরণের বিধানসহ কৃষি সংস্কার (agrarian reform) ও অন্যান্য জনকল্যাণমুখী কর্মকা- (যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি) ছাড়া বণ্টন বৈষম্য রোধের প্রকৃত কোনো উপায় নেই।

নিরঙ্কুশ দারিদ্রের বিপরীতে আপেক্ষিক দারিদ্র উচ্ছেদ বা নির্মূল সম্ভব নয়, হ্রাস সম্ভব। কারণ বিষয়টি তুলনামূলক। এক শ্রেণীতে পাঠরত দু'জনের পরীক্ষার ফল ভিন্ন হয় বিভিন্ন কারণে। আবার দু'জনের ফল ভিন্ন হতে বাধ্য– এ কথাও অসত্য হতে পারে। দু'জনের প্রথমজন যদি জন্মসূত্রে স্বল্প ওজনের (low birth weight) এবং সেই সঙ্গে দারিদ্রের কারণে অপুষ্টিবাহিত হয় (বলা হয় জন্ম প্রক্রিয়ার দু'বছরের মধ্যে মস্তিষ্ক কোষের মূল বিকাশ ঘটে থাকে) আর দ্বিতীয়জন যদি ঠিক উল্টো বৈশিষ্ট্যের হয়, তাহলে দু'জনের পরীক্ষার ফল ভিন্ন হবে। আর দু'জনেই অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বাহক হলে (প্রথমজনকে দ্বিতীয়জনের বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত করলে) কি তুলনামূলক ফল ভিন্ন হবে? আমাদের দারিদ্র গবেষকেরা এসব নিয়ে মাথা ঘামান বলে আমার জানা নেই। তবে আমার বিশ্বাস, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে পরীক্ষার ফল বিষয়ক দারিদ্র হ্রাস নয়, উচ্ছেদই সম্ভব। সুতরাং, সামাজিক বৈষম্য-অবৈষম্যের বিচারে নিরঙ্কুশ দারিদ্র আপেক্ষিক আর আপেক্ষিক (বা তুলনামূলক) দারিদ্র নিরঙ্কুশ। নিরঙ্কুশ ও আপেক্ষিক দারিদ্রের মর্মার্থ অনুধাবনে বিষয়টি আমাদের দারিদ্রাবস্থা বিশ্লেষণ ও দারিদ্র উচ্ছেদ (নির্মূল)

এবং/অথবা দারিদ্র হ্রাসের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

দারিদ্র ও মানব (মানবিক) উন্নয়ন যে পরস্পর সম্পর্কিত এ বিষয়েও আমাদের চিন্তা কাঠামোতে যথেষ্ট ভ্রান্তি আছে বলে মনে হয়। নয়া উদারবাদী পরিকল্পনা প্রণেতাসহ দাতাগোষ্ঠি প্রায়শই আমাদের বুঝিয়ে থাকেন যে, উন্নয়ন হলে দারিদ্র স্বয়ংক্রিয়ভাবেই কমে যাবে। আমি মনে করি উল্টো – দারিদ্র উচ্ছেদ হলে উন্নয়ন হবে অথবা দারিদ্র উচ্ছেদ টেকসই উন্নয়নের প্রধান পূর্ব শর্ত। আসলে উন্নয়ন বলতে তারা যা বুঝিয়ে থাকেন সে অর্থে তা হবে না। তারা উন্নয়ন বলতে মোট উৎপাদনের বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধির হার অথবা মাথাপিছু জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি বুঝিয়ে থাকেন। আমি অনেক দেশের নাম উল্লেখ করতে পারি যে সব দেশে এসব মাপকাঠিতে উন্নয়ন হলেও সেই সঙ্গে দারিদ্র হ্রাস পায়নি, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে বৈষম্য-মাত্রা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। **সুতরাং দারিদ্র ও বৈষম্য বিমোচন উদ্দিষ্ট 'উন্নয়ন'-এর নতুন সংজ্ঞা প্রয়োজন**। উন্নয়ন হতে হবে এমন একটি প্রক্রিয়া যা মানুষের চয়নের স্বাধীনতা (freedom of choice) নিশ্চিত করে, বিস্তৃত করে। এ অর্থে উন্নয়ন হতে হবে স্বাধীনতা মধ্যস্থতাকারী প্রক্রিয়া (freedom mediated process) যেখানে জনগণের জন্য পাঁচ ধরনের চয়ন-স্বাধীনতা নিশ্চিত হতে হবে: অর্থনৈতিক সুযোগ (economic opportunity), সামাজিক সুবিধাদি (social facilities), রাজনৈতিক স্বাধীনতা (political freedom), স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা (guarantee of transparency) ও সুরক্ষার বা নিরাপত্তার নিশ্চয়তা (protective security)। উন্নয়ন দর্শন কৌশল যদি এসব স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয় শুধুমাত্র তখনই উন্নয়নের সঙ্গে দারিদ্র বিমোচিত হবে অথবা দারিদ্র-বৈষম্য বিমোচন টেকসই উন্নয়নের পূর্ব শর্ত হিসেবে কাজ করবে। মানবিক উন্নয়নের এ দর্শনটি হতে হবে **দেশের মাটি-উত্থিত উন্নয়ন দর্শন** (home grown development philosophy) যে দর্শনের মূল ভিত্তি-বিষয়সমূহ হবে– পূর্ণাঙ্গ জীবন বিনির্মাণে সবার সম-সুযোগের নিশ্চয়তা; বহিস্থদের অন্তর্ভুক্তিকরণ (বঞ্চিত, নিঃস্ব, দুস্থ, দুর্দশাগ্রস্ত, দুঃখী মানুষ); মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগের নিশ্চয়তা; মানুষ নিজের জন্য যে জীবন মূল্যবান মনে করেন সেলক্ষ্যে সুযোগের সম্প্রসারণ; অ-স্বাধীনতার সব উৎসমুখ বন্ধ করা; সাংবিধানিক ও ন্যায়-অধিকার-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন; মানুষের অসীম সক্ষমতা বৃদ্ধির সব পথ সম্প্রসারণ; বঞ্চনার-চক্র ভেঙ্গে ফেলা; এবং মানুষের জন্য সম্মানজনক জীবন নিশ্চিত করা। মানবিক উন্নয়নের এ দর্শনে দারিদ্র-বৈষম্য বিমোচন হবে উন্নয়নের লক্ষ্য, উপলক্ষ নয় (যেটা আমাদের ক্ষেত্রে উল্টো)।

- বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এখন "সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য" (Millenennium Development Goals) নিয়ে ভাবছেন যার প্রথম লক্ষ্য হল "চরম দারিদ্র ও ক্ষুধা নির্মূল করা" (২০১৫ সালের মধ্যে অর্দ্ধেকে নামিয়ে আনা)। জাতিসংঘের MDG-তে যেহেতু রাষ্ট্র হিসেবে আমরা স্বাক্ষর করেছি সেহেতু আন্তর্জাতিক ফোরাম থেকে শুরু করে দেশের সংশ্লিষ্ট যে কোনো ফোরামে আমরা "দারিদ্র-ক্ষুধা নির্মূল/উচ্ছেদের" কথা জোরেশোরেই বলতে পারি। সেই সাথে অবশ্যই আমাদের বলতে হবে যে জাতিসংঘে যখন আমরা "দারিদ্র নির্মূল"-এ স্বাক্ষর করলাম তখন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিলে কেন "দারিদ্র হ্রাসের" কথা বলছি। 'নির্মূল' ও 'হ্রাস' তো এক কথা নয়। এ দ্বৈততা কেন? একি নেহায়েত দ্বৈততা না'কি কমিটমেন্ট-এর অভাব, প্রতিশ্রুতি ও সদিচ্ছার অভাব? এ বিষয়ে জোরে কথা বলে কী হবে তা জানি না, তবে যুক্তি থাকলে উচ্চকণ্ঠ হতে অসুবিধা কোথায়?

- পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দারিদ্র ও বৈষম্য হ্রাস নিয়ে যা বলা হচ্ছে এ বিষয়ে আমরা দু'ভাবে

ভাবতে পারি: প্রথমত: এ দেশের দরিদ্র মানুষের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট যা কিছু দারিদ্র বিমোচনে প্রয়োজন ছিল অথচ "পরিকল্পনা দলিলে" জায়গা পায়নি তা চিহ্নিত করা এবং উচ্চস্বরে বলা। যেমন দেশে ২ কোটি বিঘার বেশী যে খাস জমি ও জলা আছে তা কিভাবে দরিদ্র মানুষের ন্যায্য হিস্যাতে রূপান্তরিত হবে (?); অথবা দরিদ্র বেকারদের (প্রধানত: যুব দারিদ্র) কি হবে (?); অথবা বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্প কল-কারখানা খোলা নিয়ে ভাবনাটা কি?; অথবা গত ৩৫ বছরে বিদেশী ঋণ-অনুদানের প্রায় ২০০,০০০ কোটি টাকার লুটপাট, আর প্রায় ৭০০,০০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ পুঞ্জিভূত কালো টাকার কি হবে? ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত: পাঁচসালা পরিকল্পনায় এমন কি আছে যা দিয়ে দরিদ্র মানুষ বুঝবে যে দারিদ্র দূর হচ্ছে (?); বাস্তবায়ন কৌশলগুলো কী এবং তাতে দরিদ্র মানুষ কিভাবে অংশগ্রহণ করবেন? এ ক্ষেত্রে জনকল্যাণমুখী অর্থনীতিবিদদের দায়িত্ব হতে পারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে "নিজস্ব-দেশজ (home grown)" দারিদ্র-বৈষম্যহ্রাসমুখী উন্নয়ন দর্শন ও নীতি-কৌশল প্রণয়ন করে সেটা প্রচার করা এবং যুক্তি থাকলে তা গ্রহণে নাগরিক সমাজ ও সরকারকে পরামর্শ দেয়া। এদেশের দরিদ্র মানুষের নিজস্ব "দারিদ্র-বৈষম্য বিমোচন কৌশল দলিল" প্রণয়ন কোন জোর জবরদস্তির বিষয় নয়– এটা দরিদ্র মানুষের অধিকার নিশ্চিত করার নীতি-কৌশল হিসেবেই ভাবতে হবে।

- দারিদ্র-বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে 'উন্নয়ন'-এর রূপরেখা কেমন হবে বিষয়টি এখনও পর্যন্ত আমাদের অজানা। শুধু দারিদ্রের মর্মবস্তুর নিরিখেই নয়, দারিদ্র-বিমোচন লক্ষ্যের উন্নয়ন কর্মকা- কেমন হতে পারে, এ বিষয়েও আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি যথেষ্ট মাত্রায় দুর্বল বলে আমি মনে করি। দারিদ্র বিষয়ক কোন জ্ঞানতত্ত্বের অস্তিত্ব এ দেশে আছে কি'না, সে বিষয়েও আমি সন্দিহান।

এ বিষয়ে দ্বিমত নেই যে দারিদ্রের বিভিন্ন রূপের বিস্তৃতি, মাত্রা, গভীরতা ও তীব্রতা এখন যা এবং যে দিকে এগুচ্ছে, প্রবণতার চাকাটি তার উল্টো দিকে আনতে হবে। আর সেটাই হবে আমাদের সংবিধানের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রকাশের সর্বোৎকৃষ্ট মানদ-। স্বাধীনতার পরে বিশেষত: ১৯৭৫ পরবর্তী বিগত পঁয়ত্রিশ বছরে আমাদের দেশে উত্তরোত্তর অধিক হারে দারিদ্রের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন (production and reproduction of poverty and inequality) হয়েছে। দারিদ্রের উৎস–বৈষম্যের বিকাশ হয়েছে অবারিত। বৈষম্য সৃষ্টির উৎসসমূহে কি অর্থনীতি, কি রাজনীতি, কি শিক্ষা-সংস্কৃতি– সর্বত্র এক আত্মঘাতি লুণ্ঠণ সংস্কৃতি (culture of plundering) জেঁকে বসেছে। এই লুণ্ঠণ সংস্কৃতির চরিত্র-নিয়ামক হ'ল কালো টাকা, সন্ত্রাস, পেশি-শক্তি, ঘুষ, দুর্নীতি, কুশাসন-অপশাসন, দমন-নিপীড়ন ইত্যাদি। পুঁজিবাদ বিকাশে লুণ্ঠণ নিয়ামক ভূমিকা পালন করে কিন্তু এদেশে আত্মঘাতি লুণ্ঠণ প্রক্রিয়া জাতীয় পুঁজি বিকাশে ব্যর্থ হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর ১৯৭৫ পরবর্তী অর্থনীতির হরিলুট, বৈষম্য বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি যে "দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদে" (criminalization trap) পড়েছে এবং তা থেকে দারিদ্র পুনরুৎপাদিত হচ্ছে এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন ছাড়া দারিদ্র-বৈষম্য বিমোচিত হবে না। পরিকল্পনা দলিলে মৌলিক এ বিষয় সম্পর্কে কোনই বক্তব্য নেই। বিষয়টি নিম্নরূপ:

অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদ রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কার্যকরী চাহিদা (effective demand) বৃদ্ধি করছে; আর ক্রমবর্দ্ধমান রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী

করছে।

গত তিরিশ বছরে সরকারীভাবে যে প্রায় ২.৫ লাখ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য এসেছে, তার ৭৫ ভাগ লুণ্ঠণ করেছে অর্থনীতি—রাজনীতির দুর্বৃত্ত গোষ্ঠি। ফলে ক্ষমতাধররা অধিকতর ক্ষমতাবান হয়েছেন আর ক্ষমতাহীন দরিদ্রের অক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্ষমতাবানেরা এক ধরনের নিকৃষ্ট পুঁজির (ব্রিফকেস পুঁজি বা কমিশন/দালাল পুঁজি) মালিক হয়েছেন। এ পুঁজি অনুৎপাদনশীল। উৎপাদনশীল বিনিয়োগে এর কোনই আগ্রহ নেই।

ক্ষমতাবানেরা এখন কালো অর্থনীতির একটা বলয় সৃষ্টি করেছেন, যে দুষ্টচক্রে বছরে এখন ৭৫-৮০ হাজার কোটি কালো টাকার সৃষ্টি হয়। এ বলয়ে যাদের অবস্থান, তারাই আবার ২৫ হাজার কোটি টাকার ঋণখেলাপি (লুণ্ঠণ সংস্কৃতিতে যুক্ত হয়েছে ঋণখেলাপি সংস্কৃতি)। এরাই বছরে ১৫ হাজার কোটি টাকার ঘুষ-দুর্নীতিতে জড়িত। এরাই বছরে কমপক্ষে ৩০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ মুদ্রা পাচার (money laundering) করছেন; এরাই অর্থনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রে এক ধরনের স্থবিরতা সৃষ্টি করেছেন যেখানে দারিদ্র বিমোচন অসম্ভব। এরাই আবার রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে এবং/অথবা তাকে ব্যবহার করে দারিদ্র বিমোচন কর্মকা- দুরূহ করছেন।

অতীতে দেখা গেছে দুর্বৃত্ত-বেষ্টিত সরকার তার বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে যত না মানুষকে গুরুত্ব দিয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়েছে লুণ্ঠণের খাতকে। যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ বিনিয়োগ করে বাংলাদেশকে সম্পূর্ণরূপে যক্ষ্মা ও কুষ্ঠরোগ মুক্ত করা সম্ভব, তার সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে অপ্রয়োজনীয় সব খাতে। বাজেট ঘাটতি হবে অথচ অনুৎপাদনশীল ব্যয় উদ্বৃত্ত হবে। এ ধরনের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত আর যাই হোক দারিদ্র বিমোচন উদ্দিষ্ট নয়। এরাই আবার অতীতে প্রাক-নির্বাচনী জাতীয় বাজেটে অসৎ উদ্দেশ্যে ৬ হাজার কোটি টাকা থোক বরাদ্দ করেছেন।

ক্ষমতাবান দুর্বৃত্তদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতিও গড়ে উঠেছে যা উত্তরোত্তর সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও মূল্যবোধ সংশ্লিষ্ট দারিদ্র বৃদ্ধি করছে (যার সবগুলি সংবিধানের ১১, ২৬-২৯, ৩১-৩২, ৩৫-৪১, ৪৩-৪৬ অনুচ্ছেদসমূহের পরিপন্থী)।

সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, একটি আত্মঘাতি লুণ্ঠণ প্রক্রিয়া অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজকে দুর্বৃত্তায়িত করার মাধ্যমে সকল ধরনের বৈষম্য সৃষ্টির ভিত্তি সুদৃঢ় করেছে যা দারিদ্র সৃষ্টিতে পালন করছে কেন্দ্রিয় ভূমিকা। এহেন অবস্থায় দারিদ্র হ্রাস (উচ্ছেদের কথা আপাতত ভুললেও চলবে) আদৌ সম্ভব কি?

দারিদ্রের কয়েকটি নতুন রূপ যেমন শিশু-দারিদ্র, যুব-দারিদ্র, প্রবীণ-দারিদ্র– এসব নিয়ে এদেশে এখনও পর্যন্ত তেমন ভাবনা-চিন্তা নেই বললেই চলে। বিষয়টি পরিকল্পনা দলিলে তেমন কোনো গুরুত্ব পায়নি। বাংলাদেশে শিশু দারিদ্রের মাত্রা, গভীরতা ও তীব্রতা সামগ্রিক দারিদ্রের চেয়ে বেশি। যুবকদের বিশাল অংশ বেকার। আর যুব-বেকারত্ব সৃষ্টি করছে বিশাল এক বাহিনী যা ব্যবহার করছেন কালোটাকার মালিক, রাজনীতিবিদ এবং ধর্ম-ভিত্তিক জঙ্গীরা। যুবদারিদ্র উদ্ভূত নিরাশা সৃষ্টি করছে বিভিন্ন ধরনের নবতর পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক অস্থিরতা। যুবদারিদ্র নিয়ে বাণিজ্য এখন অনেকের জন্য বেশ লাভজনক। দারিদ্রের নতুন মাত্রা সৃষ্টি হয়েছে প্রবীণ জনগোষ্ঠির মধ্যেও। একদিকে আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি ও যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যাওয়া (অধিকহারে একক পরিবার সৃষ্টি) আর অন্যদিকে প্রবীণদের জন্য

রাষ্ট্রীয়ভাবে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের অনিশ্চয়তার ফলে ক্রমবর্দ্ধমান হারে সৃষ্টি হচ্ছে বয়স্ক-দারিদ্র। আমাদের দারিদ্রাবস্থা নিরূপণে দারিদ্রের এ তিনটি নতুন রূপ (শিশু দারিদ্র, যুবদারিদ্র ও বয়স্ক দারিদ্র)—নিশ্চিতভাবেই উপেক্ষিত। এসব নিয়ে হয়ত বা দু'একটি প্রকল্প নেয়া হয়েছে, ভবিষ্যতে হয়ত বা আরও প্রকল্প হাতে নেয়া হবে। আবারও আমরা প্রস্তর যুগে অনুপ্রবেশ করবো কারণ আরও কয়েকটি প্রকল্পের প্রস্তর ফলক উন্মোচিত হবে। কিন্তু যুব, শিশু ও বয়স্ক-দারিদ্র সৃষ্টির উৎসে হাত দেয়া হবে না।

এদেশে সংগঠিত মূল্য সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট দারিদ্র-বঞ্চনা পুনরুৎপাদনে অনেক বছর ধরেই জোর ভূমিকা রাখছে। প্রকৃত বাজারের তথ্যের ভিত্তিতে (অর্থাৎ যে দামে মানুষ দ্রব্য/পণ্য কেনেন– খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভুত উভয়ই) "সংগঠিত মূল্য সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট" যে পরিমাণ অর্থ লুট করেছে তা সম্পর্কে আমার হিসেবটি নিম্নরূপ: "সংগঠিত মূল্য সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট"– নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য কৃত্রিমভাবে (artificially) বাড়িয়ে গত সরকারের প্রায় ৫ বছরে এ দেশের জনগণের কাছ থেকে মোট ২৮৬,১১০ কোটি টাকা লুট করেছে। মোট লুটের মধ্যে ১৯৩,৮১৭ কোটি টাকা (৬৮%) লুট করেছে খাদ্য-খাতে আর বাদ বাকী ৯২,২৯৩ কোটি টাকা (৩২%) লুট করেছে খাদ্য-বহির্ভূত খাতে। মোট লুটের ৭২ ভাগ হয়েছে গ্রামে আর ২৮ ভাগ হয়েছে শহরে। এ লুটের শিকার হয়েছেন ১ কোটি ৮২ লাখ দরিদ্র পরিবার (৯ কোটি ১০ লাখ মানুষ), ৪৮ লাখ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার (২ কোটি ৪০ লাখ মানুষ), আর ৩০ লাখ মধ্য-মধ্যবিত্ত পরিবার (১ কোটি ৫০ লাখ মানুষ)। 'মূল্য সন্ত্রাসী সিন্ডিকেটের' লুটতন্ত্র বহাল আছে– বিষয়টি 'সিস্টেমের' অংশ।

মূল্য সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট-এর প্রত্যক্ষ শিকার ১৫ কোটি মানুষের বাংলাদেশে ১৪ কোটি মানুষ (দরিদ্র, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্য-মধ্যবিত্ত)। 'মূল্য সন্ত্রাসের' কারণে দরিদ্র মানুষকে পরিবার চালাতে গিয়ে হয় খাদ্যভোগ কমাতে হয়, অথবা পুষ্টিহীন হতে হয়, অথবা খাদ্য-বহির্ভূত খাতে (বিশেষ করে স্বাস্থ্য-চিকিৎসা ও শিক্ষায়) ব্যয় কমাতে হয়, অথবা অতীতের সঞ্চয় ভেঙ্গে ফেলতে হয়, অথবা দুর্দশাগ্রস্ততার কারণে সম্পদ (যাই ছিল) বেচতে হয় (distress sale)– অর্থাৎ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে দরিদ্র মানুষ নিঃস্ব হয়ে ভিক্ষুকে রূপান্তরিত হন। অনেকটাই অনুরূপ অবস্থা হয় নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে। আর মধ্য-মধ্যবিত্ত পরিবার– যাদের অনেকেই শিক্ষিত কিন্তু বেকার–এর অবস্থা দ্রুত অধোগতির দিকে নেমে যায়। অতএব, 'মূল্য সন্ত্রাসের' এ প্রক্রিয়ায় ১৪ কোটি মানুষের (দেশের ৯৩% মানুষ) দারিদ্র-দুর্দশা-অসহায়ত্ব বৃদ্ধি পায়: দরিদ্র হয় দরিদ্রতর; নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের একাংশ দরিদ্র মানুষের দলে যোগ দিতে বাধ্য হন; আর মধ্য-মধ্যবিত্ত মানুষের একাংশ অবশ্যই নিম্ন-মধ্যবিত্তের দলে যেতে বাধ্য হন। পরিকল্পনা দলিলে এসব বিশ্লেষণ নেই। আর এ অবস্থায় তথাকথিত "ম্যাক্রো ইকনমিক স্ট্যাবিলিটি" স্রেফ কথার মার-প্যাচ– বুদ্ধিবৃত্তিক জালিয়াতি মাত্র। যেখানে ম্যাক্রো-মাইক্রো অমিল-বেমিল (mismatch) বিষয়টি সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়; ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিলও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়।

সংগঠিত সিন্ডিকেটের এসব মূল্য সন্ত্রাসীরা বৃহৎ পর্দার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ঘনিষ্ঠ সহচর মাত্র। সংগঠিত সিন্ডিকেটভিত্তিক এসব মূল্য সন্ত্রাসীরা শুধু চালের মূল্য নিয়েই সন্ত্রাস করে না, এ সন্ত্রাস পিয়াজ-রসুন-ডাল-তেল-গুড়োদুধ-বাস ভাড়া-গ্যাস-পানি-বিদ্যুত-বীজ হয়ে রাজনৈতিক অঙ্গন পর্যন্ত বিস্তৃত, যার প্রধান শিকার নিঃসন্দেহে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষ। এ ছাড়াও ভুললে চলবে না যে ইতোমধ্যে মৌলবাদের অর্থনীতির শক্ত ভীত সৃষ্টি হয়েছে এবং সেইসাথে মৌলবাদী জঙ্গীত্ব যে 'আত্মঘাতি বোমা সংস্কৃতি' চালু করেছে তা জীবনের নিরাপত্তা হ্রাসসহ মজুতদারী-

কালোবাজারী বৃদ্ধির মাধ্যমে জনজীবন অধিকতর দুর্বিষহ করছে। নূতন এ অবস্থাটা মূল্য সন্ত্রাস বৃদ্ধির সহায়ক যা দারিদ্র-বৈষম্য বাড়ায়। সুতরাং মূল্য সন্ত্রাসের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি যতদিন থাকবে ততোদিন দ্রব্যমূল্য বাড়বে এবং দারিদ্র-বৈষম্য বাড়বে– এ বিষয়ে সন্দেহের যৌক্তিক কোন কারণ নেই। একদিকে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন-সৃষ্ট মূল্য সন্ত্রাস আর অন্যদিকে মৌলবাদী জঙ্গীত্বের কারণে মূল্য সন্ত্রাস বৃদ্ধি– দারিদ্র-বৈষম্য পুনরুৎপাদনের এসব সমীকরণ গভীর ভাবনার বিষয়। পরিকল্পনা দলিলে এসব ভাবনার কোনোই উল্লেখ নেই।

তথ্য ভিত্তিক আমার হিসেব এ দেশে দুর্বৃত্তায়ন-দুর্নীতি-সন্ত্রাসতত্ত্বকে আরো শক্তিশালী করে – এ বিষয়ে কারো দ্বিধা থাকার কথা নয়। আর অন্যদিকে লুটের এসব হিসেবপত্তর এও নির্দেশ করে যে ওরা প্রচুর কালোটাকার মালিক হয়েছে যার একাংশ তারা লুটপাট তন্ত্র জিইয়ে রাখতে ব্যয় করবে। আবার এ কথাও সত্য যে এত লুট যারা করলো– মানুষের ন্যায়-অধিকার বাস্তবায়িত হবার প্রক্রিয়ায় তারা কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? পরিকল্পনা দলিলেও এসব প্রতিফলিত হয়েছে।

পরিকল্পনা দলিলে দারিদ্র-বৈষম্য হ্রাসে আঞ্চলিক সহযোগিতাসহ বিশ্বায়ন নিয়ে কিছু নির্দেশনামূলক বক্তব্য আছে। "দরিদ্রদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে ইচ্ছুক"(!)– এমন অনেক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের অনেকেই এখন এসব নিয়ে মুলতঃ দাতাদের পয়সায় বিশ্ববাণিজ্য সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সভা-সম্মেলনে দেশ বিদেশ যাচ্ছেন। দেশের দরিদ্র মানুষদের স্বার্থ উদ্ধারে দেশের ভিতরে কাজের চেয়ে বিদেশমুখীতা ইদানিং বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। এসব করে কী লাভ/কার লাভ– বিষয়টি বেশ দুর্বোধ্য; তবে আমি জানি "বাজার দরিদ্র বান্ধব নয়"। অবাধ বাজারভিত্তিক বিশ্বায়নের যুগে (যেখানে অসম প্রতিযোগিতা মুখ্য বিষয়, non-level playing field) প্রায়শই শুনি এবং পরিকল্পনা দলিলেও বলা হচ্ছে যে আমাদের দেশের শ্রমজীবী মানুষকে অবাধে অন্যদেশে শ্রমশক্তি বিক্রির সুযোগ দিলে এ দেশের দারিদ্র দূর হয়ে যাবে। আপাত দৃষ্টিতে যুক্তির কথা বলেই মনে হয়। কিন্তু যখন দেখি প্রত্যন্ত গ্রামের নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত পরিবারের তরতাজা একজন যুবক জমি-জমা-সম্পদ-সম্পত্তি বিক্রি করে ২ লাখ টাকা ব্যয় করে ২ বছরের চুক্তিতে মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে রাত-দিন পরিশ্রম করে ২ বছরে মোট ২ লাখ টাকা আয় করেন তখন দারিদ্র দূর হল কোথায়? আসলে এসব করে যা হলো তাকে এভাবে বলা চলে "আমাদের ঐ যুবকটি মধ্যপ্রাচ্যে ২ লাখ টাকার সমপরিমাণ বিনিয়োগ করলো যার রিটার্ন শূন্য অথবা নেগেটিভ" অর্থাৎ "মধ্যপ্রাচ্যে আমরা ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট করলাম যার নেট রিটার্ন পাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য"। এ তো সম্পদ হাত ছাড়া হবার এক নূতন পদ্ধতি মাত্র (net drain of resources)। সুতরাং দারিদ্র বিমোচনের পদ্ধতি হিসেবে বিদেশে শ্রমশক্তি বিক্রির ক্ষেত্রে আমাদের নূতনভাবে ভাবতে হবে। সরকারকে এসব নিয়ে ভাবতে হবে কারণ এ খাত থেকে সরকার বছরে ৭০ হাজার কোটি টাকা পাচ্ছেন (যা একক খাত থেকে সরকারের সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন)। সংশ্লিষ্ট এ বিষয়ে আমরা কি এ বিবেচনা মাথায় রাখতে পারি যে এখন থেকে ২০ বছর পরে ইউরোপে ২ কোটি বিদেশী শ্রমশক্তি দরকার হবে; স্বদেশের উন্নয়নের জন্য মানবশক্তি পরিকল্পনা জরুরী; প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তি পরিকল্পিতভাবে বিদেশে পাঠালে অনেক গুণ বেশি লাভ হতে পারে; আর দাতাদের অর্থে বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্রিক সভা-সমিতিতে বিদেশ না গেলে কি ক্ষতি(?)।

গ্রাম-শহর নির্বিশেষে আবাসনের দারিদ্র বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি পরিবারের (অর্থাৎ ৫ কোটি মানুষের) নিজ মালিকানাধীন মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। এরা বাস করেন গ্রামে, শহরের বস্তিতে (অনেকেই ভাসমান), শিল্প এলাকায়, চরাঞ্চলে, শহরতলীতে ইত্যাদি। এসব মানুষের আবাসনের

দারিদ্র যথাসম্ভব দ্রুত দূর করার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে। আবাসনের দারিদ্র সংশ্লিষ্ট এ বিষয়েও পরিকল্পনা দলিলে তেমন কোনো কার্যকর দিকনির্দেশনা নেই।

দরিদ্র মানুষের সন্তানেরা যে স্কুলে যেতে পারে না অথবা স্কুলে গেলেও কপালে জোটে অতি নিম্নমানের শিক্ষা অথবা শিক্ষা শেষের আগেই স্কুল পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়– এ দারিদ্রের কি হবে? এদেশে প্রতি ৩ জন ছাত্রের ১ জন মাদ্রাসার ছাত্র; মাদ্রাসা ছাত্রদের অধিকাংশই দরিদ্র পরিবারের সন্তান; মাদ্রাসা পাশ করা ছাত্রদের ৭৫ ভাগই বেকার থাকে– শিক্ষার এ দারিদ্রের কি হবে? শিক্ষা তো সাংবিধানিকভাবেই মানব-অধিকার– মানুষ তো জন্মসূত্রে এ অধিকার পায়। কিন্তু এতো ঢাক-ঢোল পেটানোর পরে যখন বলা হয় যে বাংলাদেশে এখন প্রায় সবাই স্কুলে যায় তখন দরিদ্র পরিবারের সন্তান-সন্ততিদের কয়জন উচ্চশিক্ষা পেয়েছেন? এসব বিষয় পরিকল্পনা দলিলে তেমন স্থান পায়নি।

শ্রমজীবী-দরিদ্র পরিবারের কোন একজন সদস্য-সদস্যার যদি এমন কোন অসুখ হয় যখন অপারেশন করা এবং/অথবা ঔষধ কিনতে অনেক অর্থের প্রয়োজন তখন আসলে অবস্থাটা কী হয়? প্রথমেই যা করতে হয় তা হলো পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ এবং/অথবা সারা জীবনের সঞ্চিত সম্পদ (যদি থেকে থাকে) এক নিমেষে বিক্রি করতে হয় (যাকে অর্থনীতিবিদরা বলেন "দুর্দশাগ্রস্ততার কারণে সম্পদ বিক্রি", distress sale)। আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের কাছে ধার-দেনা করতে হয়। এ হচেছ অনেকটা "নদী ভাঙ্গনে– এক রাতে সব কিছু নদীগর্ভে চলে যাবার মত"। এরপর ঐ মেহনতী মানুষটির কাজ থাকলেই কী না থাকলেই কী। "স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি" যদি মানুষের সাংবিধানিক অধিকারই হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে সংবিধানের এ বাধ্যবাধকতার বাস্তবায়নে পরিকল্পনা দলিলে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনাসমূহ কি? ব্যাপারটি কি এ রকম যে যতোদিন কালো টাকার মালিকেরা আমাদের প্রতিনিধিত্ব করবে ততোদিন এসবে কার্যকরী তেমন কিছু হবে না। তাহলে তথাকথিত উন্নয়ন কৌশল, দারিদ্র হ্রাস কৌশল, আর ৫-৬% অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দিয়ে কী হবে?

আমার মনে হয় আমাদের নির্মোহভাবে জানা প্রয়োজন এদেশের মানুষ কেন ভিক্ষুক হয়(?); মানুষ কেন নি:স্ব হয়(?); মানুষ কেন রিক্সা-ভ্যান-ঠেলাগাড়ী চালায়(?); শিশুরা কেন কাউরান বাজারে টুকরির মধ্যে ঘুমায়(?); মহিলারা কেন ইট ভাঙ্গে(?) ইত্যাদি। আমার গবেষণায় আমি দেখেছি যে সখ করে কেউই ভিক্ষুক হয় না– আজকের পুরুষ ভিক্ষুকটি প্রথমে ছিলেন গ্রামের কৃষক অথবা আদমজীর শ্রমিক, তারপর চালিয়েছেন রিক্সা, তারপরে হয়েছেন অসুস্থ, আর তারপরেই ভিক্ষুক, আর এখন অসুখ বেড়ে তিনি অকাল মৃত্যুর দিকে এগুচ্ছেন। আর আজকের মহিলা ভিক্ষুকটি হয় ঐ পুরুষ ভিক্ষুকের স্ত্রী অথবা গ্রাম থেকে আসা নিঃস্ব একজন মানুষ যিনি ঝি-এর কাজ করেছেন, তারপর এক পর্যায়ে অসুস্থ হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি শুরু করেছেন, আর এখন অসুস্থতা বেড়ে মৃত্যুর প্রহর গুণছেন। এসব অকাল মৃত্যুর দায় দায়িত্ব কার? এসব মানুষ নিয়ে পরিকল্পনা দলিলের "দারিদ্র হ্রাস কৌশল" কি? আসলে কিছু নেই। সম্ভবত ক্রমবর্দ্ধমান দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে এসব ভাববারও কথা নয়। পরিকল্পনা দলিলে "দারিদ্র হ্রাস কৌশলেরই" এ এক মহা দারিদ্র। আমার মনে হয় কিছু মানুষ কেন, কিভাবে, কোন প্রক্রিয়ায় অঢেল সম্পদের মালিক হন– তা জানলে দারিদ্রের কারণও অনেক দূর জানা যাবে। আসলে দারিদ্র নিয়ে যারা সত্যিকার অর্থে চিন্তা ভাবনা-গবেষণা করছেন তাদের এখন 'ধনী' নিয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন। আর বিষয়টি পরিকল্পনা দলিলে থাকা উচিত ছিল। বিষয়টি থাকা উচিত ছিল এ কারণেও যে বর্তমানে বাংলাদেশে বছরে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ১ কোটি টাকা (বা তদুর্ধ্ব) আয়কর দেন মাত্র ৪৬ জন, অথচ আমার তো মনে হয় এ সংখ্যাটা হবার কথা ৫০,০০০ জন, অর্থাৎ সরকার একমাত্র ব্যক্তিগত পর্যায়ের আয়কর

খাত থেকেই বছরে পেতে পারে ৫০,০০০ কোটি টাকা (যা আমাদের উন্নয়ন বাজেটের বেশি)।

উপসংহার: তাহলে কিভাবে ভাববো, কি করবো?

রাজনীতিতে নির্ধারক হবে কালোটাকার মালিক আর সরকারে গিয়ে তারা দারিদ্র-বৈষম্য হ্রাস করবে — এ বিশ্বাসের যুক্তি কোথায়? আর সে কারণেই প্রচলিত রাজনীতিবিদরা সরকারে ও সরকারের বাইরে দারিদ্র নিয়ে ব্যবসা করবেন —এটাই স্বাভাবিক। দারিদ্র-বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে হাজারো প্রকল্প (project) গৃহীত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে; কিন্তু কখনও, কোনও অবস্থাতেই এমন কর্মসূচী (program) নেয়া হবে না, যেখানে বাজেটের প্রধান অংশ বরাদ্দ করে প্রকৃত দারিদ্র-বৈষম্যের সকল নির্দেশকভিত্তিক সময় বেঁধে দিয়ে কর্মকা- সংবিধানের নির্দেশ মোতাবেক পরিচালিত হবে, ব্যর্থতার শাস্তি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে এবং শাস্তির বিধান কার্যকরী করা হবে। এগুলো হবে না, কারণ সে ক্ষেত্রে লুণ্ঠণ প্রক্রিয়া ও বৈষম্য সৃষ্টির সব পথ-ঘাট বন্ধ হয়ে যাবে। এসবই কিন্তু প্রতিফলিত হয়েছে পাঁচশালা পরিকল্পনা দলিলে। কারণ পরিকল্পনা দলিলে দারিদ্র-বৈষম্য প্রপঞ্চদ্বয় সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; দারিদ্র-বৈষম্যের বহুরূপ ও সংশ্লিষ্ট মাত্রা আদৌ হিসেবে আনা হয়নি; দারিদ্র-বৈষম্যের ভিত্তি-কারণসমূহ বিশ্লেষিত হয়নি; বৈষম্য যে দারিদ্র বাড়ায় এ কথা অনুক্তই রয়ে গেছে; দরিদ্র মানুষের 'ভূমি' নেই একথা বলা হলেও ভূমি সংস্কার ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি একেবারেই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে; দারিদ্র-বৈষম্যের বিভিন্ন রূপের কোনটি, কবে নাগাদ, কতদূর এবং কিভাবে নিরসন হবে তার কোন দিক-নির্দেশনা নেই– নেই কৌশলাদির বিবরণ; ধরেই নেয়া হয়েছে যে উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্বয়ংক্রীয়ভাবেই দারিদ্র-বৈষম্য নিরসন করবে অর্থাৎ উচ্চতর প্রবৃদ্ধিই হবে সব রোগমুক্তির একমাত্র মহৌষধ, আবার (এক জায়গায় বলা হয়েছে "বৈষম্য-অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র হ্রাসের গতি হ্রাস করে); বলা হয়েছে উৎপাদন বাড়লে দারিদ্র-বৈষম্য হ্রাস হবে তবে বণ্টন ন্যায্যতার প্রসঙ্গই আনা হয়নি (অথচ সংবিধানে উদ্ধৃত হয়েছে)।

দুর্বৃত্তবেষ্টিত যে সমাজ-অর্থনীতি আমরা সৃষ্টি করেছি, সে কাঠামোতে আদৌ দারিদ্র-বৈষম্য হ্রাস সম্ভব কি'না, ভেবে দেখতে হবে। ভাবতে হবে এ বিষয়ে রাজনৈতিক ঐকমত্যের প্রসঙ্গটি; গভীরভাবে ভাবতে হবে মধ্যবিত্তের মানসিক-কাঠামোর রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা। "বাজার দরিদ্র-বান্ধব নয়"। সেই সঙ্গে বিশ্বায়নের তোড়ে মুক্তবাজার ততোধিক দরিদ্র-বিরোধী। ভাবতে হবে, নিজের পায়ের তলায় মাটি শক্তিশালী করার কৌশল নিয়ে। যার ফলে যথাদ্রুত সম্ভব দারিদ্র উচ্ছেদ হবে; বৈষম্য হবে তিরোহিত। এসব ভাবনার প্রতিফলন নেই পরিকল্পনা দলিলে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে আমরা আমাদের সংবিধান মেনে দারিদ্র ও বৈষম্য হ্রাসে দেশোপযোগী নীতি ও কৌশল প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম। তবে তা অন্যের উপর নির্ভারশীল হয়ে হবে না। আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস আমরা পারি। এ লক্ষ্যে আমার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা হলো দারিদ্র-বৈষম্য নিরসনসহ সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পাঁচশালা পরিকল্পনা দলিলে নিম্নলিখিত ১২ দফা এজেন্ডা অন্তর্ভুক্তকরণ ও তা বাস্তবায়নের নীতি-কৌশল নির্দেশ করা প্রয়োজন:

১. বণ্টন ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণসহ উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি;

২. অধিকতর কার্যকরী ও উৎপাদনশীল কৃষি;

৩. অধিকহারে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ ন্যায্য মজুরীর নিশ্চয়তা;

৪. শিল্পায়ন: অনু, ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ (স্ব-কর্মসংস্থানসহ);

৫. কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার;

৬. নারীর ক্ষমতায়ন;

৭. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার;

৮. জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে রূপান্তর (মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, সাংস্কৃতিক কর্মকা-, ইত্যাদি);

৯. শক্তিশালী সরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাত;

১০. সুসংগঠিত ও বিস্তৃত সামাজিক ইন্স্যুরেন্স সিস্টেম (সামাজিক সুরক্ষার সবকিছু– সেফটি নেট থেকে শস্য বীমা পর্যন্ত);

১১. রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও বিচারিক সংস্কৃতির গণমুখী রূপান্তর; এবং

১২. রাষ্ট্রিয়-সরকারি উন্নয়ন কর্মকা- জনগণের স্বতস্ফুর্ত সক্রিয় অংশগ্রহণ (উন্নয়ন হবে আন্দোলন) ।

আমি মনে করি, জনগণের স্বার্থ সবকিছুর উর্দ্ধে । আর দারিদ্রসহ জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বলতে আমরা কী বুঝবো এবং সেগুলো রাষ্ট্র ও সরকার কিভাবে নিশ্চিত করবে তা তো সংবিধানেই আছে । মানুষ হিসেবে দরিদ্র মানুষ সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার সমঅংশীদার । আমাদের সংবিধান ঊনচল্লিশ বছর আগে মানুষের জন্য যে স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে, সেটা বাস্তবায়িত হলে দারিদ্র নিয়ে সেমিনার সিম্পোজিয়াম দরকার হবে না । মনে রাখা জরুরী যে এ দেশের দারিদ্র প্রধানত মনুষ্যসৃষ্ট–ভূমিকম্প বা অলৌকিক কোন কিছু এখানে দারিদ্রের কারণ নয় । সুতরাং শেষ কথা, মানুষ যেন জন্মসুত্রে দরিদ্র হতে না পারে, সে শর্ত সৃষ্টি করতে হবে; সকল মানুষ মানুষ হিসাবে সমান । সুতরাং বৈষম্য সৃষ্টির পথ বন্ধ করলেই তো সমস্যার সমাধান হয়ে যায় । তাহলে এসব কিছু হিসেবে এনে দারিদ্র-বৈষম্য নিরসন উদ্দিষ্ট পাঁচশালা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে সমস্যাটি কোথায়?